প্রীতিভাজনেষু রিমি ও রূপসাকে
আন্তরিক স্নেহ ও ভালবাসায়...

ভূমিকা

এই গ্রন্থে দুটি অপেক্ষাকৃত বড়ো কিশোর গল্প এবং একটি পূর্ণাঙ্গ কিশোর উপন্যাস স্থান পেয়েছে। বলা বাহুল্য চিরাচরিত কিশোর রচনার নিরিখে এই তিনটি কাহিনিই ব্যতিক্রমী।

'সোনার বুদ্ধ' একটি গ্রামীন পটভূমিতে মূর্তি চোরাচালানের রহস্য উন্মোচনের কাহিনি। আর 'জলপথের নিষিদ্ধ এলাকা' ইংল্যান্ডের লেক-ডিস্ট্রিক্ট নামের জনপ্রিয় ভ্রমণাবাসে জলবিহারের ভয়াল কাহিনি। দুটি বড়ো গল্পের মধ্যেই লেখকের ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা এমন আকর্ষণীয় বর্ণনায় ফুটে উঠেছে, যা একইসঙ্গে কৌতূহলোদ্দীপক, রোমহর্ষক, রহস্যময়, আবার আন্তরিকও বটে।

'শবদেহে রত্নসম্ভার' উপন্যাসের বিষয়বস্তু বাংলা কিশোর উপন্যাসের ইতিহাসে নতুনতম সংযোজন। ডাক্তারি ছাত্রদের এ্যানাটমি ডিসেকশন করা এবং শেখার অভিজ্ঞতালব্ধ এহেন বিষয় নিয়ে রহস্য উপন্যাস রচিত হতে পারে, এই ধারণা বঙ্গসাহিত্যে ছিল না। লেখক নবকুমার বসু স্বয়ং শল্যচিকিৎসক এবং অতীতে শবব্যবচ্ছেদবিদ্যা (Anatomy) বিষয়ের শিক্ষকতা করেছেন। ডিসেকশন কালে মৃতদেহের পাকস্থলী থেকে রত্নসম্ভার আবিষ্কারের ঘটনা যে শেষপর্যন্ত সমাজ ও প্রশাসনের কতটা গভীরে প্রোথিত, তার হদিস পাওয়া যায় এই উপন্যাসের পর্ব থেক পর্বান্তর পাঠ করার সময়। বিষয়, বৈচিত্র এবং বর্ণনা ও সংলাপের মাধ্যমে এই রচনা শুধু কিশোরদের জন্যই না, বাংলা সাহিত্য পাঠকদের জন্যও এক চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা হওয়ার দাবিদার। একঘেয়ে অতিপ্রাকৃত কিংবা তথাকথিত ভৌতিক গল্পের বাজারি বিজ্ঞাপনে যখন ক্লিশে হয়ে এসেছে বাংলা কিশোরসাহিত্য, বক্ষমান তিনটি কাহিনিই সেক্ষেত্রে পাঠকদের জন্য নতুনতর উপহার।

দক্ষিণ কলকাতা
১৫.০১.২০২৫

নবকুমার বসু

সূচিপত্র

সোনার বুদ্ধ	১১
জলপথের নিষিদ্ধ এলাকা	২৫
শবদেহে রত্নসম্ভার	৪১

সোনার বুদ্ধ

মামার বাড়ি যাওয়ার নামে প্রতিবারই আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় বুড়ো। তার পিছনে যথেষ্ট কারণও আছে। স্কুলের ছুটি কলকাতার একঘেয়ে জীবনযাপন বৈচিত্র্য মামা-বাসীদের প্রশ্রয়ের সাহচর্যে অবাধ স্বাধীনতা উপভোগ, মায়ের চোখ রাঙানি এড়িয়ে ফুচকা, ঘুগনি, আলুকাবলি খাওয়া... ইত্যাদি সবই আছে। এবার তার সঙ্গে একটি অতিরিক্ত কারণ যুক্ত হওয়ায় বুড়োর উত্তেজনা প্রথম থেকেই দ্বিগুণ হয়ে রয়েছে।

আচ্ছা বুড়োর সঙ্গে তার আগে পরিচয় করিয়ে দেওয়াটা জরুরি। বুড়োর আসল নাম হচ্ছে সোমদেব গুহ। কিন্তু দাদামশাই অর্থাৎ দাদু মানে মায়ের বাবা সতীনাথ চৌধুরী, প্রায় জন্মের পর থেকেই ওকে বুড়ো নামে ডাকতে ডাকতে ওটাই হয়ে গেছে ওর ডাকনাম। ছোটোবেলা থেকে ওর ভাবভঙ্গি বড়োমাথা চোখ ঘুরিয়ে কথা বলা এসব দেখতে দেখতেই দাদামশাই বলতেন আমাদের রুমির ছেলের জন্ম থেকেই একশো বছরের পাকা মাথা। বয়স কম হলে কী হবে? মাথাটি অতি সরেস!তো এহেনও ছেলের নাম যে বুড়ো হবে তাতে আর আশ্চর্য কী! আর বয়স বাড়তে বাড়তে সত্যি বোঝা যাচ্ছিল বুড়ো কিন্তু বেশ বুদ্ধিমান ছেলে। যদিও লেখাপড়া করার দিকে ওর তেমন মন নেই। মোটামুটি পরীক্ষায় পাশটাস করে যায়, কিন্তু অনেক কিছু ওর বেশ খুঁটিয়ে দেখার স্বভাব। আসলে ওর কৌতূহল খুব বেশি আর বেশি বলেই এই দশ বছর বয়সের মধ্যে ও এমন কয়েকটা ঘটনা ঘটিয়েছে যা নিয়ে বেশ শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। অবশ্য ঘটনা ঘটাব বলে বুড়ো কিছু করেনি, কিন্তু অতিরিক্ত কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে ও কিছু কিছু অপরাধমূলক কাজকে চিহ্নিত করে দিয়েছে। আর যথারীতি এমন ধরনের কৌতূহল চরিতার্থ করতে গিয়ে ওর নিজেরও যে বিপদে পড়ার সম্ভাবনা থাকে সেটাও সত্যি। বাবা-মাও সেই কারণে কিছুটা সতর্ক হয়ে থাকেন। কোথাও বেড়াতে গেলে আগে

থেকে সাবধান করে দেন যেন কিছু গন্ডগোল না করে বসে।

কিন্তু বুড়ো যে ইচ্ছে করে তেমন কিছু করে ফেলে তা তো না, হঠাৎ কোনো একটা ব্যাপারে খটকা লাগলেই ওর জানতে ইচ্ছে করে ব্যাপারটা ওরম হলো কেন? অমন তো হওয়ার কথা না, তাহলে!

তো যাই হোক মামার বাড়ি যাওয়ার ব্যাপারে এবার একটা অতিরিক্ত উত্তেজনা আছে বুড়োর, সেই কথা বলছিলাম। কারণটা আর কিছু না, মামার বাড়ির কাছে বুড়ো শুনেছে একটা খুব সুন্দর জাপানি প্যাগোডা আর সেটাকে ঘিরে বিশাল চমৎকার একটা পার্ক বানানো হয়েছে। আরেকটু খুলে বলা যাক ব্যাপারটা। বুড়োর মামার বাড়ি কলকাতা থেকে প্রায় ৩২ কিলোমিটার উত্তরে। জায়গাটার নাম মাদরাল বা মাদ্রাল যাই হোক। মাদরাল আবার উত্তর চব্বিশ পরগনার নৈহাটি ভাটপাড়া থেকে চার পাঁচ কিলোমিটার পূর্বে। কলকাতা থেকে ট্রেনে এলে নৈহাটি জংশনেই নামতে হয়। তারপর রিকশা কিংবা গাড়ি করে মাদরাল। আগে গাড়ি যাওয়ার মতো রাস্তা ছিল না। মাদরালের দিকে কাঁচা রাস্তায় গরুর গাড়ি চলত ইদানীং বেশ টানা চওড়া রাস্তা হয়েছে। পাকা রাস্তায় গাড়ি চলাচল করে কলকাতা থেকে কল্যাণী হাইওয়ের দিয়ে।

বুড়োরা মধ্য কলকাতার পার্ক সার্কাস অঞ্চলের বাসিন্দা। ওর বাবা সমেন্দ্রনাথ গুহ স্থানীয় পরিচিত চিকিৎসক সকালে বাড়িতে এবং বিকেলে বেক বাগানের চেম্বারে প্র্যাকটিস করেন। একসময় ওর মা-ও সি আই টি রোডের একটা নার্সিংহোমে হাউসকিপিং এর কাজ করতেন। কিন্তু মূলত বুড়োর পড়াশোনা দেখার জন্যই সম্প্রতি বাইরের কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। বুড়ো ডনবসকো স্কুলে ক্লাস ফাইভে পড়ে। এখন থেকেই ওর পড়ার চাপ নেহাত কম নয়। তা সত্ত্বেও এক সপ্তাহের ছুটিতে মা যখন মাদরাল মামার বাড়ি যাওয়ার কথা তুললেন বুড়ো একেবারে আনন্দে নেচে উঠল।

এই ছুটিটা গরম আর পুজোর ছুটির মাঝামাঝি সময়ে। গরমটা কমে এসেছে আবার বর্ষারও শেষ দিক, নিজের ঘরের টেবিল লাইট জ্বালিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বুড়ো অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষীরের পুতুল পড়ছিল। তখনই বাবা-মার কথোপকথন কানে এল খাওয়ার ঘর থেকে। রাতে প্রতিদিনই এরকম সময় বাবা চেম্বার থেকে ফিরে আসার পরে খাওয়ার টেবিলে বাবা-মা কথা বলেন, বুড়ো জানে সাধারণত ওর সেদিকে কান যায় না। যদি না হঠাৎ কোন প্রসঙ্গে ওর নাম উচ্চারিত হয়। বুড়োর কোনও এল বাবা মাকে বলছেন, "আমার কোনও অসুবিধা নেই যদি তোমরা সপ্তাহখানেকের জন্য

ঘুরে আসো, আমি একেবারে পরের দিকে একদিনের জন্য গিয়ে তোমাদের নিয়ে আসব।"

মা বললেন, "আসলে বুড়োর স্কুলে এক সপ্তাহে ছুটি রয়েছে বলেই..."

বাবা বললেন, "এখন পুজোর ছুটিটা শুরু হয়ে গেল নাকি?"

মা হেসে বললেন, "না না কোথায় পুজো! সে তো এখনও দেড় মাসের উপর দেরি, এটা মাঝখানে এক সপ্তাহ ছুটি দেয় বিলেতের হাফটার্মের মতো।"

বাবা বললেন, "বুড়ো জানে মামার বাড়ি যাওয়া হতে পারে?"

মা বললেন, "ওকে কিছু বলিনি এখনও। তোমার সঙ্গে কথা হলে তারপর... ওদিকে বাবাও টেলিফোন করেছিলেন মাদরালের বাড়ির গায়ে জাপানি প্যাগোডা আর পার্কটাও নাকি খুবই সুন্দর দেখার মতো হয়েছে, দূর দূর থেকে লোক যাচ্ছে বেড়াতে দেখতে।"

বাবা বললেন, "বেশ তো? তোমরা তাহলে কাল কিংবা পরশুই বেরিয়ে পড়ো।"মা বললেন, "কালকে হবে না তোমার জন্য রান্নাবান্না করেই ফ্রিজে তুলে রেখে যাব, তা ছাড়া বুড়োর হোমওয়ার্ক গুছিয়ে নিয়ে যেতে হবে পরশু দিনে বেরিয়ে পড়ব।" পাশের ঘরে বুড়ো আর টু শব্দটি করল না, পরম খুশিতে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল।

পরের দিনটা যথারীতি দুরন্ত উত্তেজনায় কাটল। বিশেষ করে মামার বাড়িতে গেলেই ছোটোমামা আর মাসির সঙ্গ বরাবর ওর কাছে খুবই লোভনীয়, ওদের দুজনের কারোরই এখনও বিয়ে হয়নি। যদিও ছোটোমামা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে এখন সদ্য চাকরিতে ঢুকেছে আর মাসি এম.এ পড়ে। সামনের বছরেই ওর বিয়ে। বড়োমামা আর মামিও খুব ভালো দুজনেই বুড়োকে খুব ভালোবাসেন। বড়োমামা ব্যারাকপুর মহাকুমা কোর্টের পুলিশ অফিসার ওদের একমাত্র মেয়ে টুম্পার বয়স পাঁচ বছর। এবং খুব মিষ্টি আর দাদু দিদিমণি তো আছেনই।দুপুর নাগাদ ট্রেনে করেই বুড়োরা নৈহাটি পৌঁছাল। সদ্য শরৎকালের হাওয়া আসতে শুরু করেছে। এই সময়ে প্রকৃতিতে একটা উজ্জ্বল ভাব হয়। আকাশ নীল, গাছপালার পাতা বৃষ্টির জলে ধুয়ে সবুজ হয়ে থাকে। ঝিরঝিরিয়ে হাওয়া বয়। বুড়ো জানে দাদু সম্প্রতি একটা মারুতি জেন গাড়ি কিনেছেন। যেটা ছোটোমামা এবং মাসি দুজনেই চালায়। শনিবার ছুটির দিন বলেই যথারীতি ছোটোমামা প্লাবন গাড়ি নিয়ে বুড়োকে আর দিদিকে নিতে এল নৈহাটি স্টেশনে। গাড়ি করে যেতে যেতেই মাদরালের নতুন প্যাগোডা বা বৌদ্ধ মন্দির এবং পার্ক সম্পর্কে নানান তথ্য পেয়ে গেল বুড়ো। একটা

খুব ছোট্ট বুদ্ধমন্দির নাকি বহুকাল ধরেই মাদরালে ছিল এবং স্থানীয় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা সেখানে যাতায়াত করতেন। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না বলে বড়ো করে প্যাগোডা বানানো কিংবা বৌদ্ধ ধর্মস্থান বানানোর উদ্যোগ কেউ নিতে পারেননি। সম্প্রতি কল্যাণীর কাছে জাপানি আর ভারতীয়রা একসঙ্গে কৃষক ফ্যাক্টরি করেছে এবং জাপানিরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বলেই মাদরালের জায়গাটায় তারা সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে সকলের জন্যই একটা মনোরম প্যাগোডা এবং পার্ক বানানোর উদ্যোগ নিয়েছেন। স্থানীয় অন্য ধর্মের মানুষরাও খুশি কেননা শেষ পর্যন্ত সব ধর্মই তো মানুষের কল্যাণের কথাই বলে। তাছাড়া জাপানিদের এই উদ্যোগে স্থানীয় সব মানুষেরই উপকার হবে রাস্তাঘাট ভালো হবে, দোকানপাট হবে, বাচ্চাদের খেলার জায়গা ভবিষ্যতে স্কুল-কলেজও হতে পারে। ভারতীয় বৌদ্ধরাও এই আয়োজনে খুশি।

বস্তুত ছোটোমামার সঙ্গে গাড়িতে যেতে যেতেই বুড়োর মনে হল বিগত তিন-চার মাসে সত্যিই এই দিকটার বেশ উন্নতি হয়েছে যদিও এখনও মাদরালের দিকে একটা গাছপালাওয়ালা নিঝুম শান্ত গঞ্জের ভাব আছে, তাহলেও রাস্তা বেশ ভালো। দুপাশে সবুজ ধান খেত চোখে পড়ে। দূরে ছোটো ছোটো গ্রামগুলোর স্নিগ্ধ ভাব নারায়ণপুর, জাগুলিয়া, দেউলপাড়া শিমুলিয়া, গ্রামগুলো যেমন বর্ধিষ্ণু তেমনি নিবিড়। বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে পাকা বাড়িও হয়েছে। আবার বেশ মাঠ-পুকুর-সবজি খেতও রয়েছে। প্লাবন বলল পুরোনো বৌদ্ধ মন্দিরে নাকি সত্যি সত্যি ছোটো সোনার বুদ্ধ মূর্তি ছিল। এখন তার আদলেই বিরাট বড়ো মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। জাপান সরকার স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই অনেক টাকা খরচ করেছে এই মন্দির তৈরি করতে এবং কাছাকাছি জায়গাটার ও উন্নতি কল্পে। মন্দিরে দুবেলা আরতি হয় এবং গুরুগম্ভীর পরিবেশে প্রদীপ জ্বালিয়ে বাংলা এবং জাপানি ভাষায় মন্ত্র উচ্চারণ করে বুদ্ধের বন্দনা করা হয়।বিকেলের আলো থাকতে থাকতেই বুড়োরা দাদুর বাড়ি তথা মামার বাড়ি পৌঁছে গেল। এবার বেশ কয়েক মাস পরে বুড়োরা এল সুতরাং সবাই খুব খুশি। প্রাথমিক কথাবার্তা হাসাহাসি খাওয়া-দাওয়ার পরে প্লাবন বলল, "আজকেই একবার প্যাগোডা দেখে আসবি নাকি বুড়ো? এখনও তো দিনের আলো আছে। যদি যেতে চাস তো..."

বুড়ো তো এমনিতেই এক পায়ে খাঁড়া। সঙ্গে সঙ্গে বলল, "প্লিজ, ছোটোমামা চলো এখনই ঘুরে আসি..." মা তা সত্ত্বেও সাবধান করলেন বুড়োকে, বললেন, "ঠিক আছে, যাও কিন্তু ছোটো মামার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।

প্লাবনকেও রুমি বললেন, "শোন বেশি দেরি করিস না, অন্ধকার হয়ে আসছে। তাছাড়া মাদরাল হলেও জায়গাটা এখন অনেকটা পালটে গেছে। কেমন যেন নতুন নতুন মনে হয়। কত নতুন লোকজন চারপাশে।"

প্লাবন বলল, "চিন্তা করো না দিদি। নতুন মনে হলেও আমাদের জন্ম এখানে। তাছাড়া বুদ্ধমন্দিরে সারাক্ষণ লোকজন থাকে। আমরা একটু আরতি বন্দনা শুনেই চলে আসব। বুড়োকে আমি কালকে সব ঘুরিয়ে দেখাব।" প্লাবনের সঙ্গে বেরিয়ে গেল বুড়ো।

সত্যি বলতে কি মামার বাড়ি একেবারে গায়েই বলা যায় বুদ্ধমন্দির আর প্যাগোডা। শুধু পিছন দিকে বড়ো ঝিল আছে বলেই ওদিকটা একটু নীচু এবং একটু ঘুরে যেতে হয়। নয়তো প্যাগোডা এবং পার্কের অনেকটা দিব্যি দেখা যায় দাদুর বাড়ির বিশেষ করে দোতলা থেকে।

বিকেলের আলো পড়ে আসছিল... সেইজন্য খুব একটা যে ঘুরে দেখা গেল তা নয়। তাহলেও জায়গাটার বেশ একটা আন্দাজ হয়ে গেল বুড়োর। পার্কটা আসলে একটা বড়ো বাগানের মতো। সামনে বিশাল ফটক। তার ওপর সোনার জলে লেখা আছে 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'। ভিতরে প্রচুর ফুলফলের বাগান ছাড়াও নানান খেলাধূলার ব্যবস্থা আছে। দোলনা, ঢেউ কুচকুচ, রোপ-ল্যাডার, ছোটো নাগরদোলা। কৃত্রিম পাহাড় বানানো আছে যার ওপর চড়া যায়। আবার গোলকধাঁধাও আছে। স্লিপ করে নেমে আসার স্লাইড আছে। আবার একটা ছোটো সুইমিং পুলের মতো জায়গায় নৌকো চড়ারও ব্যবস্থাও আছে।কিন্তু সন্ধে হয়ে আসছিল বলে, ওসব কিছু চড়া হল না। শুধু প্যাগোডার মধ্যে বুদ্ধমূর্তি দেখতে গেল বুড়োরা। সত্যি সত্যি বিশাল বুদ্ধমূর্তি। সাধারণ মানুষের থেকেও বড়ো সাইজের। অপূর্ব প্রশান্ত আর স্নিগ্ধভাব সাদা রঙের মূর্তির। চমৎকার কারুকাজ করা মাথার মুকুট। সবই ঝকঝকে সাদা পাথরের। মন্দিরের গর্ভগৃহের মধ্যে একটা হালকা নীল রঙের আলোর আভাতেই যেন মূর্তি আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। সত্যি সত্যি ভক্তি হওয়ার মতো। পরিবেশটাও যেমন গম্ভীর, তেমনই শান্ত। একটা চমৎকার সুগন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। বিশাল গর্ভগৃহের এপাশে-ওপাশে বৌদ্ধভিক্ষুর সাজে কয়েকজন নারী-পুরুষ ধ্যান করছেন নীরবে। তাঁদের পরনে সাদা পোশাক, মুণ্ডিত মস্তক। চোখ-নাক-মুখ দেখে কয়েকজনকেই বোঝা যায় তাঁরা জাপানের মানুষ।

প্লাবনের কথাতেই বুড়োর বিহ্বলভাবটা কাটল। প্লাবন বলল, "আসল সোনার বুদ্ধদেবকে দেখতে পেলি?"

বুড়ো বলল, "হ্যাঁ, ওই তো দেখতে পাচ্ছি। একদম বড়ো মূর্তিটারই ছোটো সংস্করণ।"

"তা নয়", প্লাবন বলল, "আসলে ছোটো মূর্তিটা থেকেই ওটা বানানো হয়েছে। ছোটোটার ওজন দেড় কেজি, পুরোটা সোনার।"

বুড়ো বলল, "উরিব্বাস! তাহলে তো লক্ষ টাকার ওপর দাম হবে!"

"লক্ষ কী রে! ওই মূর্তির দাম কোটি টাকার ওপর।"

বুড়ো বলল, "কিন্তু একটা ব্যাপার দেখেছ ছোটোমামা, সোনার মূর্তিটা যেন একটু সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে, যেন পড়ে যাবে দেখে মনে হচ্ছে। শক্ত করে বসানো নেই।"প্লাবন বলল, "বোধহয় রিপেয়ার-টিপেয়ার করছে... সেইজন্য।" ওদের কথার মধ্যেই বড়ো চুল-দাড়িওয়ালা একজন লোক এসে গর্ভগৃহের আলো নেভাতে লাগল এবং যাঁরা বসে বসে ধ্যান করছেন, তাঁদের ছাড়া সবাইকে প্যাগোডার বাইরে চলে যেতে বলল। সুতরাং বুড়োরাও বেরিয়ে এল।আঁধার ভাব হয়ে এসেছে বাইরে। প্লাবন বুড়োকে নিয়ে প্যাগোডার পিছনে ঝিলের ধারে নিয়ে গেল। বেশ বড়ো আর সুন্দর ঝিল, জল টলটল করছে। মাঝে মাঝে এক একটা পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। ঝিলের ওপারে অনেকখানি ঘিরে রীতিমতো জঙ্গল। এখন পাখপাখালিরা সেই জঙ্গলের গাছে তাদের ঠিকানায় ফিরে যাচ্ছে। পশ্চিম দিক থেকে সূর্যের শেষ রশ্মি পড়েছে গাছের মাথায়। সেই গেরুয়া আলোয় এখন মায়াময় দেখাচ্ছে প্রকৃতিকে। বুড়ো দেখল ঝিলের ঘাটে একটা ছোট্ট নৌকো বাঁধা রয়েছে। প্লাবন বলল, "পার্ক আর প্যাগোডার কেয়ারটেকাররা মাঝেমাঝে ওই নৌকো নিয়ে ঝিলের রক্ষণাবেক্ষণ করে, মাছেদের খাবার দেয়, ময়লা-টয়লা পড়লে পরিষ্কার করে।"বেশ চমৎকার এক রাউন্ড বেড়ানো সেরে, খানিকটা ক্লান্ত হয়েই বুড়ো ফিরে এল মামার বাড়িতে। এমনিতেও সারাদিনের ধকল গেছে। রাতে আজ আর হোমওয়ার্ক নিয়ে বসতে হবে না, সেটা বুড়ো জানে। কেননা, বেশ কয়েকমাস পরে দাদুর বাড়িতে এসে, মা-ও আজ দিব্যি রিল্যাক্সড মুডে আছে ও জানে।খাওয়াদাওয়া সেরে, একটু তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়ল বুড়ো। দোতলার ঘরে শোওয়ার ব্যবস্থা। মা আর ও দুজনে এক ঘরে পাশাপাশি খাটে শোবে। আরামদায়ক বিছানায় শোওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে বুড়ো ঘুমিয়ে পড়ল। একদম ভোরবেলা নানান রকম পাখিদের কিচিরমিচির আর ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙল বুড়োর।

চোখ খুলেই প্রথমে একটু ধাতস্থ হয়ে নিল মামার বাড়ির পরিবেশ

সম্পর্কে। হ্যাঁ, ওই তো পাশের বিছানায় মা ঘুমোচ্ছেন। বুড়ো টের পেল, দিনের আলো ফুটেছে, কিন্তু এখনও সূর্যদেব দৃশ্যমান হননি। অস্ফুট একটা শান্ত আর নিস্তব্ধ ভাব হয়ে রয়েছে চতুর্দিকে। ওদের কলকাতার বাড়ির থেকে এদিককার প্রকৃতি-পরিবেশ সবই অনেক চুপচাপ। এখানে ভোরের হাওয়ায় একটা হিমেলভাব টের পাওয়া যায় এখনই।

পায়ে পায়ে সন্তর্পণে দরজা খুলে পশ্চিমের ব্যালকনিতে বেরিয়ে এল বুড়ো। স্নিগ্ধ হাওয়া বইছে বাইরে। ওর সামনেই এখন সেই বিরাট উঁচু প্যাগোডা, আর পিছন দিকের ঝিল দেখা যাচ্ছে। ভোরের হাওয়ায় ঝিলের জলে ছোটো ছোটো ঢেউ উঠছে। চারদিক শান্ত, নিঝুম। কেউই ঘুম থেকে ওঠেনি।হঠাৎ বুড়োর চোখে পড়ল, গতকাল প্রায় সন্ধের সময় ঝিলের ঘাটে যে নৌকোটা দেখেছিল, কে যেন সেইটা বেয়ে জঙ্গলের দিক থেকে ফিরে আসছে। এত ভোরে ওদিক থেকে নৌকো নিয়ে কে আসবে! তাছাড়া নৌকো তো বাঁধা ছিল ঝিলের এপারে— মন্দিরের দিকে। তার মানে কেউ নৌকো নিয়ে ঝিলের ওপারে জঙ্গলে গিয়েছিল কোনো কারণে, এবং এখন ফিরে আসছে।তাহলে কি জঙ্গলের ভেতর কারুর ঘরবাড়ি আছে? ওদিকে কারুর যাতায়াত আছে? কিন্তু এত ভোরে যাতায়াত করবে কেন? বোঝা যাচ্ছে নৌকোতে একজন মেয়েই রয়েছে, এবং যেন মনে হচ্ছে তার একটা ত্রস্ত, সন্ত্রস্ত ভাব রয়েছে। লোকটার মুখ-মাথা সব একটা ঘষা মতো চাদরে ঢাকা। নৌকোর দাঁড় টানতে টানতেই সে বার বার এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। ব্যাপারটা মোটেও স্বাভাবিক মনে হল না বুড়োর। শুধু তাই নয়, সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে যেন একটা রহস্যময় গোপনীয়তা রয়েছে বলে ওর মনে হল। কিন্তু এত সকালে ওর আর কী-ই বা করার আছে!নৌকোশুদ্ধ মাথা-মুখ ঢাকা লোকটাও একটু পরে প্যাগোডার আড়ালে চলে গেল। বুড়ো আর কিছু দেখতেও পেল না। মনে মনে ভাবল, ঠিক আছে, পরে তো যাবেই, তখন খোঁজ করে দেখবে— জঙ্গলের ওপারে কারা এবং কেন যাতায়াত করে? কী আছে ওদিকে?

কিন্তু বুড়োকে খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না।

একটু বেলা হতেই মাদরালের লোকের খবর মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল যে, বুদ্ধমন্দির থেকে সেই দেড় কেজি ওজনের সোনার বুদ্ধ মূর্তি হারিয়ে গেছে, বা চুরি হয়ে গেছে। এদিকে ছুটির দিন বলে এমনিতেই লোকজন বেশি আসবে প্যাগোডা দেখতে। কিন্তু মূর্তি চুরি যাওয়ার ঘটনায় প্রথম থেকেই

গেট বন্ধ রাখা হল। খবর গেল পুলিশের কাছেও। বেলা সাড়ে নটা-দশটার মধ্যেই মাদরাল গ্রাম সচকিত হয়ে উঠল পুলিশের গাড়ি, জিপ আর ডিটেকটিভদের আনাগোনায়।একমাত্র বুড়ো মনে মনে টের পেয়ে গেল, ভোরবেলার ওই নৌকা চালিয়ে আসা লোকটার সঙ্গে সোনার বুদ্ধ চুরি হওয়ার নিশ্চয়ই কোথাও একটা যোগ আছে। ওই লোকটাকে যদি ধরা যায়, বলা যায় না হয়তো, সোনার বুদ্ধও ফিরে পাওয়া যাবে। কিন্তু ও কী করেই বা চিনবে লোকটাকে? মন্দিরের কোনও কর্মচারী কিংবা বলা যায় না পূজারি, কেয়ারটেকার যে কেউই হতে পারে। কিন্তু একথা তো ঠিক যে, গতকাল ছোটো মামার সঙ্গে গিয়ে ও সেই মূর্তি দেখেছিল। অর্থাৎ সন্ধে থেকে আজ ভোরের মধ্যেই মূর্তি খোয়া গেছে।এবার হঠাৎই বুড়োর মনে পড়ল, ওর কিন্তু একবার মনে হয়েছিল, সোনার মূর্তিটা যেন একটু সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে, এবং সেকথা প্লাবনকেও বলেছিল। এখন মনে হচ্ছে, আসলে সোনার বুদ্ধ চুরি করার জন্য, আগে থেকেই কেউ সচেষ্ট হয়েছিল এবং পাথরের বেদি থেকে মূর্তিটি উপড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। গতকাল বিকেল পর্যন্ত কাজটা শেষ করতে পারেনি। কিন্তু রাতের অন্ধকারে সেরে ফেলেছে। তারপর ভোর রাতেই পাচার করে দিয়েছে। খুব সম্ভবত নৌকো চালিয়ে আসা লোকটাই কালপ্রিট। বলা যায় না, জঙ্গলের মধ্যে বদমাশ লোকটার কোনও গোপন ঠেকও থাকতে পারে। কিংবা অন্য চোরাকারবারির আনাগোনা। একবার কি বুড়ো ওদিকটা দেখে আসতে পারে না? এখন তো ফুটফুটে দিনের আলো রয়েছে! বুড়োর মনে হল ওর কৌতূহল আর নিয়তিই যেন একটু একটু করে ওকে ঝিলে গা দিয়ে টানছে ওই জঙ্গলের দিকে। বাড়ির সবাই যখন দিব্যি গল্পে আড্ডায় মশগুল, বুড়ো আস্তে আস্তে নেমে গেল প্যাগোডার দিকে। তারপর পায়ে পায়ে চলল জলের ধার ঘেঁসে। দেখতে পেল, নৌকোটা এখন যথারীতি ঘাটে বাঁধা রয়েছে।

ঝিলের ঘাট থেকে জঙ্গলটা উঁচু মতোন। মিনিট দশের মধ্যে বুড়ো প্যাগোডার উলটো দিকের ঘাট বেয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সত্যি বেশ ঘন জঙ্গল। দিনের আলো যেন বেশ কষ্ট করে ইতিউতি ঢুকেছে। নানান কীটপতঙ্গ আর পাখিদের ডাক শোনা যাচ্ছে। সোজা ঢুকে যেতে যেতেই একটা ছোটো উঠোনের মতো জায়গা আর একটা পোড়ো মন্দিরের মতো ঘর দেখতে পেল বুড়ো। অথচ কেউ সেখানে থাকে বলে তো মনে হচ্ছে না।এদিক ওদিক ঘুরে দেখল ও। ইতিমধ্যেই উত্তেজনায় ঘামছে, কিন্তু মোটেও